আজকের সমস্যা

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

© ২০১৩ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়)
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস : আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর , পোঃ- বাগলতা , জেলা — পুরুলিয়া , পশ্চিমবঙ্গ

যোগাযোগ অফিসঃ ৫২৭ , ভি . আই . পি . নগর ; কলকাতা -৭০০ ১০০

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখী পূর্ণিমা , ১৩৬৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ পূর্ণিমা , ১৩৭৫

তৃতীয় মুদ্রাঙ্কনঃ দোল পূর্ণিমা , ১৯৯৮

চতুর্থ মুদ্রাঙ্কন : কলকাতা বইমেলা , ২০১৩

প্রকাশক : আচার্য সুগতানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব) আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ 527 ভি . আই . পি . নগর কলকাতা -৭০০ ১০০

মুদ্রাকর : আনন্দ প্রিন্টার্স ৩ / ১ সি, মোহনবাগান লেন কলকাতা -৭০০ 008

প্রাপ্তিস্থান : প্রভাত লাইব্রেরী ৬১ , মহাত্মা গান্ধী রোড , কলকাতা -৭০০ ০০৯ :

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র

ISBN 978-81-7252-336-7

।। উৎসর্গ ।।

****

যাঁকে ভালবাসতুম ও আজও ভালবাসি

সেই মহান যোদ্ধা সুভাষচন্দ্র বসুকে—

****

—শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

জ্ঞান

jiṋána

চরম নির্দেশ

“ যে দু’বেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে , মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগবেই জাগবে ও মুক্তি সে পাবেই পাবে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু’বেলা সাধনা করতেই হবে – ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম–নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম –নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ’ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প ফ ব ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n
ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

সূচীপত্র

১.পুঁজিবাদকেও সমর্থন করা যায় না ; ২.এ ধরণের অহিংসা; ৩.গঠনমূলক আদর্শ; ৪.অবস্থার চাপ সৃষ্টি; ৫.আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা; ৬.জাতিভেদ প্রথা; ৭.শিল্প ব্যবস্থা; বিকেন্দ্রীকরণ; ৮.বিকেন্দ্রীকরণ নীতি; ৯.যান্ত্রিকীকরণ নীতি: ১০.ট্রেড ইউনিয়ন; ১১.সমবায়; ১২.ভূসম্পত্তি , শিল্প , ৰাণিজ্য সব কিছুর সাধারণীকরণ; ১৩.নারী পুরুষের সমান মর্যাদা; ১৪.পণ - প্রথা; ১৫.সাত্বিকী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা; ১৬.সৰ দেশে মোর দেশ আছে; ১৭.ক্ষমা ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা; ১৮.জাতীয়তাবাদ / বিশ্বৈকতাবাদক; ১৯.বিশ্বসংস্থা রচনার অন্তরায় স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্ব খোয়াবার ভয়; ২০.ইংরেজী বিশ্ব ভাষা; ২১.বিশ্ব লিপি–রোমান লিপি; ২২.বিশ্ব - পোশাক ; ২৩. বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক সংশ্লেষণ ; ২৪.জন্ম - নিয়ন্ত্রণ

; ২৫.laboratory babies; ২৬.দলীয় রাজনীতি; ২৭. নীতি বাদীরা সঙ্ঘবদ্ধ হও; ২৮. অস্ত্রের প্রয়োজন; ২৯. রাজনীতিবিদরা বাক চাতুর্যের দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিমূঢ়

করে দেয়; ৩০. সংগ্রাম বিবর্জিত শ্রেণীহীন সমাজ কখনোই সম্ভব নয়; ৩১.শিক্ষা - ব্যবস্থার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের ;পাঠ্য – নির্বাচনের অধিকার শিক্ষাব্রতীদের; ৩২. সদ্বিপ্ররা সেবার মাধ্যমে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে ; ৩৩. গণতন্ত্রকে শাসন ব্যবস্থার চূড়ান্ত মারা যায় না; ৩৪.সমাজচক্র ঘুরে চলেছে; ৩৫. ক্রান্তি, বিক্রান্তি, বিপ্লব.....; ৩৬.প্রকৃত অধ্যাত্মদর্শনই বিশ্বসমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ; ৩৭.সংগচ্ছধ্বং

আজকের সমস্যা

০১

পরম পুরুষ আমার পিতা , পরমা প্রকৃতি আমার মাতা , আর এই ত্রিভুবন আমার স্বদেশ । আমরা সকলেই বিশ্ব - নাগরিক ।

এই জগৎ ব্রহ্ম - মানসের কল্পনা , আর এই কল্পনাধারার সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর ক্রিয়াতেই বস্তুর সৃষ্টি - স্থিতি - লয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হচ্ছে । → ব্যষ্টিগত ভাবে মানুষ যখন কিছু কল্পনা করে তখন সেই বস্তুর মালিক সে নিজেই— অন্য কেউ নয় । তার কল্পনা - সৃষ্ট শস্যক্ষেত্রে কল্পনা - সৃষ্ট মানুষ যখন ঘুরে বেড়ায় সেই শস্যক্ষেত্রের মালিক কল্পনা - সৃষ্ট মানুষ নয় — কল্পনাকারী মানুষ । এই জগৎ ব্রহ্মের কল্পনা - সৃষ্ট । তাই এর মালিকানা স্বত্ব কেবল ব্রহ্মেরই আছে — তাঁর কল্পনা - সৃষ্ট জীবের নেই । বিশ্বে স্থাবর - অস্থাবর কোন সম্পত্তিই কারোর ব্যষ্টিগত সম্পত্তি নয় । সব কিছুই তাদের সকলকার পৈতৃক - সম্পত্তি , আর সেই পিতা হচ্ছেন ব্রহ্ম । জীব দায়ভাগ ব্যবস্থার পিতৃ - শাসিত একান্নবর্তী পরিবারের মত এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারে মাত্র ।

একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের মত জীবের উচিত তাদের সাধারণ সম্পত্তি বা এজমালি সম্পত্তি উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা , সেগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগানো ও সৰাই যাতে সমান অধিকার নিয়ে খেয়ে পরে ' সুস্থ শরীর - মন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা

জীব - জগৎ একটি বৃহৎ যৌথ - পরিবার — একথা ক্ষণেকের জন্যেও ভুললে চল্ৰে না । প্রকৃতি বিশ্বের কোন সম্পত্তিই ব্যষ্টি

বিশেষের নামে লেখা - পড়া করে দেননি। ব্যষ্টিগত মালিকানার সৃষ্টি করেছে স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষেরা , কারণ এই ব্যবস্থার রন্ধ্রপথে তারা অন্যকে শোষণ করে ' নিজেদের স্ফীতোদর করবার সুযোগ পায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবমাত্রেই যখন পৈতৃক সম্পত্তি তখন কারও ঘরে প্রাচুর্যের স্রোত বয়ে যাক্ আর কেউ অনাহারে তিলে - তিলে শুকিয়ে ' মরুক এই অবস্থাটাকে ন্যায় ধর্মসম্মত বলা যেতে পারে কি ? যৌথ পরিবারে নিজের ক্ষুধা বা প্রয়োজন মত অন্ন - বস্ত্র শিক্ষা - চিকিৎসা বা আরামের ব্যবস্থা সমগ্র পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী প্রত্যেকেই পায়। কিন্তু ওই পরিবারের কোন সদস্য যদি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্ন - বস্ত্র , পুস্তক বা ঔষধ নিজের জিম্মায় আটকিয়ে রাখে তখন সে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্লেশের কারণ হয় না কি ? সেক্ষেত্রে তার আচরণ নিশ্চয়ই ধর্মবিরোধী — নিশ্চয়ই সমাজবিরোধী।

বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদীরা ঠিক এই ধরণেরই ধর্মবিরোধী বা সমাজবিরোধী জীব। নিজের ঘরে প্রাচুর্যের মাত্রাধিক্য ঘটাতে গিয়ে এরা অন্যকে ক্ষুধার জ্বালায় শুকিয়ে মারে , নিজের পোষাকের জৌলুস দেখাতে গিয়ে অন্যকে ছিন্ন কন্থা ব্যবহার করতে বাধ্য করে , নিজের প্রাণশক্তিকে বাড়াতে গিয়ে অন্যের প্রাণরস শোষণ করে ।

পরিবারের যে সদস্য অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একাত্মভাবে রাখে না যৌথ অধিকারের মহৎ আদর্শ তথা যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যটুকুকে স্বীকার করতে চায় না তাকে সামাজিক জীব বলে স্বীকার করা চলে না। প্রকৃত আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুযায়ী ব্যষ্টিগত মালিকানা ব্যবস্থাকে চরম ও পরম বলে স্বীকার করা চলে না , আর তাই **পুঁজিবাদকেও সমর্থন করা যায় না।**

(০২)

জীবের সামূহিক স্বার্থের কথা ভাবতে গেলে তাই পুঁজিবাদের উচ্ছেদ প্রয়োজন। কিন্তু এই উচ্ছেদের পন্থাটা কী ধরণের হওয়া উচিত ? হিংসা হিংসাকেই টেনে আনে — একথাটা অস্বীকার করা যায় না। হিংসার আশ্রয় না নিয়ে সংশোধনী মনোভাব নিয়ে শক্তিসম্প্রয়োগের ফলও যে ভাল হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। এ অবস্থায় করণীয় কী ? ভাল কথায় ৰুঝিয়ে বা মানবিক আবেদনের সাহায্যে পুঁজিবাদের বিলোপ সাধন যদি সম্ভবপর হয় তবে তার চাইতে ভাল কথা আর হতেই পারে না। কারণ তাতে এই বৃহৎ মানব পরিবারের শান্তির ওপরও বড় একটা চোট লাগে না। কিন্তু সবাই যে এই আবেদনে সাড়া দেৰে এমন কথা হলপ্ করে বলা যায় কি ? কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন দীর্ঘকাল

ধরে শুণতে শুণতে বুঝতে বুঝতে তথা উপযুক্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলে একদিন শোষকদেরও সুৰুদ্ধি জাগৰে। কথাটা শুণতে খুবই ভাল। এই ধরণের প্রচেষ্টাও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু কবে শোষকদের সুবুদ্ধি জাগৰে তার জন্যে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করা যায় কি ? শোষিত জনসাধারণ যে ততদিনে মরে ভূত হয়ে যাবে !

মানবিক আবেদন কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ দেবে না বা কাজ দিতে দীর্ঘকাল সময় নেৰে। তাই আবশ্যক ক্ষেত্রে কঠোর আচরণের দ্বারা পুঁজিবাদকে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে এই কি ! কিন্তু এতেও ষোল আনা কাজ হবে এমন কথা চলে না। আইনের ভয়ে যারা আপাতদৃষ্টিতে সংযত হল তারাও তাদের বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে। চোরাবাজারী , ভেজাল প্রভৃতি কেবল হুম্‌কি দেখিয়ে বা আইনের ভয় দেখিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এজন্যে প্রয়োজন বোধে কঠোরতর ব্যবস্থা নিতে হবে বা উগ্র রকমের অবস্থার চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এই অবস্থার চাপ সৃষ্টি করতে গেলে শক্তিসম্প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। শক্তিসম্প্রয়োগ না করাই যাদের মতে অহিংসা তাদের ব্যর্থ হতে হবে।

এ ধরণের অহিংসার দ্বারা পৃথিবীর কোন সমস্যারই সমাধান হবে না ।

(০৩)

কথায় কথায় পুঁজিবাদীদের সম্বন্ধে যারা কটূক্তি বর্ষণ করেন তাঁদের মনোভাবটা আমি সমর্থন করতে পারি না কারণ তাঁদের কার্যের ফলে পুঁজিবাদীরা সতর্ক হয়ে যাবার সুযোগ পায় ও অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত তথা শঠতাপূর্ণভাবে জনসাধারণকে শোষণের পথ খুঁজে বের করে। যাদের সামনে **গঠনমূলক কোনো আদর্শ** নেই তারা মিষ্টকথায় অথবা হুমকি দেখিয়ে অথবা অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে যেভাবেই পুঁজিবাদকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করুক না কেন সে কাজে তারা সক্ষম হবে না।

সূচীপত্র

(০৪)

অন্যকে শোষণ করে ধনী হবার ইচ্ছা এক ধরণের মানসিক ব্যাধি। বস্তুতঃ মানুষের মনে যে অনন্ত ক্ষুধা আছে সেই ক্ষুধা মানসিক বা আধ্যাত্মিক সম্পদে নিবৃত্ত হবার ঠিক পন্থা না পেলে জড়জগতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করে অন্যকে বঞ্চিত করার কাজে লেগে যায়। যৌথ পরিবারের কোন সদস্য যদি গায়ের জোরে বা বুদ্ধির জোরে ভাঁড়ার থেকে খাদ্যসামগ্রী নিজের জিম্মায় আটকে রেখে অন্যের ক্লেশের কারণ হয়, ঠিক তেমনি ধারা ব্যাপারটিই হয় যখন পুঁজিবাদী বলে, " আমরা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরেই সম্পদ আহরণ করেছি। যদি অন্যের বুদ্ধি বা শ্রমশীলতা থাকে তারাও আহরণ করুক, কেউ বারণ করছে না। " তারা বুঝতে চায় না যে এই পৃথিবীর ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ সীমিত, অথচ প্রয়োজন সকলকারই। একজনের প্রাচুর্যের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যের গ্রাসাচ্ছাদনে টান পড়ে। এই অন্যের প্রয়োজনের কথা বুঝতে না পারাটাই ব্যাধি। এই ব্যাধিতে যারা ভুগছে তারাও বৃহৎ মানব পরিবারেরই সদস্য, তারাও ভাই। কিন্তু মানবিক আবেদনে অথবা **অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে তাদের ব্যাধি সারাবার ব্যবস্থাই করতে হবে, তাদের ধ্বংস করবার চিন্তাও মহাপাপ।**

কিন্তু চরম ব্যবস্থা হিসেবে যেখানে হুমকি দেখাতে অথবা অবস্থার চাপ সৃষ্টি করতে হ'ল সেখানে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বভাবও যে সংশোধিত হ'ল এমন কথা বলা চলে কি ? বরং তারা সব সময়েই প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির সুযোগ খুঁজৰে I জনসাধারণকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আশু ব্যবস্থা হিসেবে অবস্থার চাপ সৃষ্টি করতে হবে , কিন্তু ব্যাধিগ্রস্তদের স্বভাব সংশোধনের জন্যে দীর্ঘকাল ধরে মানসিক তথা **আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা** রাখতে হবে I মানসিক তথা আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার সাহায্যে কারো যদি স্বভাব সংশোধন হতে অনন্তকালও লেগে যায় জীব - সমাজ তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী আছে কারণ তখন তার বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেছে— অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে তার শোষণ - ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে I

(০৬)

কায়েমী স্বার্থের আরেকটি সুন্দর নমুনা হচ্ছে জাতিভেদ প্রথা I বিদ্যা - বুদ্ধির জোরে এককালে যারা বাকি মানুষদের মাথায় চড়ে বলেছিল তাদের বংশধারার দোহাই পেড়ে এক শ্রেণীর লোক আজও সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা তথা শোষণের সুযোগ অব্যাহত রাখতে চায় I (

(০৭)

বিশ্বের কোন জীবকেই আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। বিশ্বের কোন অংশ - বিশেষকেও উপেক্ষা করতে পারিনা! তাই শিল্প ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুযায়ীই করা উচিত। বিশ্বের এক অংশের শিল্পোন্নয়ন অন্য অংশের দারিদ্র্য বা বেকারীকে ভালভাবে দূর করতে পারে না। তাই শিল্প - ব্যবস্থায় অন্ততঃ জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক পণ্য সম্পর্কিত শিল্প বা কৃষির ব্যাপারে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট গড়ে নেওয়া দরকার। অন্যথায় যুদ্ধ - বিগ্রহাদির সময়ে জনসাধারণকে বিশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। যান - বাহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ইউনিটগুলির আয়তন বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সূচীপত্র

(০৮)

শিল্পক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প দু'য়ের প্রয়োজনের কথাই স্বীকার করে নিতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি স্বয়ং - সম্পূর্ণ ইউনিট বস্ত্রবয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সূতা কয়েকটি বড় বড় সূতাকলে প্রস্তুত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এই সূতা উৎপাদনকে যদি বৃহৎ - শিল্প বলি , এর সাহায্যে পুষ্ট হবে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প। এক একটি সূতাকলকে

কেন্দ্র করে যথেষ্ট সংখ্যক বয়ন - সমবায় গড়ে নেওয়া যেতে পারে। সেখানে তন্তুবায়েরা ঘরে থেকেই বস্ত্র বয়নের সুযোগ পাৰে। বৃহৎ শিল্পের আহ্বানে তাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে না। অথচ সূতাকল নিকটে থাকায় যুদ্ধকালেও বয়নের-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকারের শিল্পকে স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে সাবেকি ধরণের যন্ত্রপাতিকেই উৎসাহ দিতে হবে। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করতে হবে। গুড় - মাহাত্ম্য প্রচার করে কলের চীনীর ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা অথবা খাদি - মাহাত্ম্য প্রচার করে কলের সুতোর সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা অর্থহীন। **তবে উন্নত যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থা তথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকেন্দ্রীকরণের কাজ যতদিন পর্যন্ত শুরু না হচ্ছে ততদিনের জন্যে গুড়, খাদি বা এ জাতীয় শিল্পকে অবশ্যই উৎসাহ দিতে হৰে ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাদেরও যে একটা স্থান আছে তা স্বীকার করে নিতে হৰে। শিল্পায়ন যেখানে মুনাফা লুঠবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেখানে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি সমর্থিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শিল্পায়ন যেখানে প্রয়োজনের তাগিদে সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে কিছুই বলবার থাকতে পারে না।**

(০৯)

বস্তুতঃ উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার অর্থই দ্রুত **যান্ত্রিকীকরণ** I প্রাচীনপন্থীরা এই যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখর I মোদ্দা কথাটা এই যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় যান্ত্রিকীকরণের অর্থ - ই জনসাধারণের অধিকতর দুঃখ — অধিকতর বেকারী I এজন্যেই প্রাচীনপন্থীরা এর বিরোধী I পুঁজিবাদকে না চটিয়ে জনকল্যাণ করতে গেলে যান্ত্রিকীকরণের বিরোধিতা করতেই হবে I কারণ যন্ত্রের উৎপাদিকা শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেলে মনুষ্য শক্তির প্রয়োজন ঠিক অর্ধেকে নেৰে যায় , আর তাই পুঁজিবাদীরা তখন ব্যাপকভাবে কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই করে I অল্পসংখ্যক আশাবাদী বলতে পারেন , " অবস্থার চাপে পড়ে মানুষ এই উদ্বৃত্ত শ্রমিক দলকে ভিন্ন কাজে নিয়োগ করবার উপায় খুঁজে বের করবে I আর এই উপায় খুঁজবার প্রচেষ্টাই বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে দেবে I সুতরাং পুঁজিবাদী কাঠামোতে যান্ত্রিকীকরণের ফল আসলে ভালই I " এমতটা কিন্তু ৰাজে না হলেও বাস্তবোচিত নয় কারণ দ্রুত যান্ত্রিকীকরণের ফলে যত শীঘ্র মানব - শ্রম উদ্বৃত্তে পরিণত হয় তত শীঘ্র তাদের কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না I উদ্বৃত্ত শ্রমজীবীরা অনাহার ও

দারিদ্র্যের ফলে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যায় । তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক চুরি - ডাকাতি , দুশ্চরিত্রতা ও বিভিন্ন ধরণের সমাজ - বিরোধী কার্যের সাহায্যে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে । এ অবস্থাটা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় নয় । কিন্তু সামূহিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এজাতীয় প্রতিক্রিয়া ঘটবার অবসর নেই । সেখানে যান্ত্রিকীকরণের অর্থ কম শ্রম— বেশী স্বাচ্ছন্দ্য । যন্ত্রের উৎপাদিকা শক্তি দ্বিগুণ হয়ে গেলে শ্রমিকদের কাজের সময় (working hours) অর্ধেক হয়ে যাবে । অবশ্য কাজের সময় কমানো পণ্যের চাহিদা ও শ্রমশক্তির দিকে চেয়েই করতে হবে ।

বিজ্ঞানের শুভ প্রয়োগের দ্বারা সামূহিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের কল্যাণই হবে ! এমনও হতে পারে যে যান্ত্রিকীকরণের ফলে হপ্তায় পাঁচ মিনিটের বেশী কাউকে মেহনত করতে হবে না । অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতে না হওয়ায় তার মানস তথা অধ্যাত্ম - সম্পদের অপচয়ও হবে না । খেলা - ধূলা সাহিত্য - চর্চা তথা অধ্যাত্ম - সাধনায় সে অনেক বেশী সময় ব্যয় করতে পারবে ।

সূচীপত্র

শ্রমজীবীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে **ট্রেড ইউনিয়ন** আন্দোলনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে এই আন্দোলন যাতে ঠিক খাতে বইতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থার দরকার। সাধারণতঃ দেখা যায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণকারীরা শ্রমজীবীদের তাদের দাবী দাওয়া তথ্য অধিকার সম্বন্ধে যতটা সচেতন করে দিতে চান সেই তুলনায় তাঁরা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করার কাজে কিছুই করেন না। এ অবস্থা দূর করৰার প্রকৃষ্ট পন্থাই হচ্ছে যে শিল্প তথ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কর্মীদের অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া। এ ব্যাপারে কেবল আদর্শবাদ প্রচার করে গেলে বা অধিক নীতিকথা শোণাতে থাকলে বিশেষ কিছু ফল হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সমূহের আর একটি বড় ক্রুটি হচ্ছে এই যে এর নেতৃত্ব বড় একটা প্রকৃত শ্রমজীবী বা কর্মীদের হাতে থাকে না। রাজনৈতিক নেতারা সবসময়েই দলীয় উদ্দেশ্য নিয়ে এতে মাতব্বরী করতে আসেন। এঁদের লক্ষ্য্য থাকে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির দিকে — শ্রমিক কল্যাণের দিকে নয়।

(১১)

শিল্প, কৃষি, ৰাণিজ্য সব কিছুই যতদূর সম্ভব **সমবায়** প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিচালিত হওয়া দরকার। এজন্যে প্রয়োজনবোধে সমবায়

সংস্থাগুলিকে বিশেষ বিশেষ ধরণের সুবিধা দিতে হবে — রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে ও ধীরে ধীরে বিশেষ বিশেষ ধরণের কৃষি , শিল্প বা বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে ব্যষ্টিগত মালিকানা বা ব্যক্তিগত পরিচালনা - ব্যবস্থা রহিত করতে হবে ।

অতিরিক্ত ক্ষুদ্রত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব ও তৎসহ জটিলতার জন্যে যে সকল সংস্থা নামবারিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা অসুবিধাজনক কেবলমাত্র সেইগুলিকেই ব্যক্তিগত পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে । ঠিক তেমনি অতিরিক্ত বৃহৎ অথবা বৃহত্ব ও তৎসহ জটিলতার জন্যে যে সকল সংস্থা সামবায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করা অসুবিধাজনক সেইগুলির ভার স্থানীয় রাজ্য সরকার (যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা) অথবা স্থানীয় লোক - সংস্থা (যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়) নিতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকার বা বিশ্বরাষ্ট্রীয় সরকারের (বিশ্বরাষ্ট্র প্রতির্ষ্ঠিত হলে) পরিচালনায় শিল্প , কৃষি বা ৰাণিজ্য সংস্থাগুলি না থাকাই বাঞ্ছনীয় কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থাগুলির পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সুযোগ তো থাকেই না , পরোক্ষ সুযোগও বড় একটা থাকে না । আর তাই পুঁজিবাদী সুবিধাবাদী বা মতলৰৰাজ রাজনীতিকেরা সহজেই সেগুলিকে হাতিয়ে নিতে পারে ও জনসাধারণের অর্থের অপচয় ঘটাতে পারে ।

সূচীপত্র

(১২)

মানুষের সকল কর্মেই মানবতার স্পর্শ থাকা উচিত। কাউকে বঞ্চিত না করার মনোভাব যার আছে সে তাই ন্যায়তঃ ধর্মতঃ সম্পত্তির ব্যষ্টিগত মালিকানা মেনে নিতে পারে না। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোটা কিন্তু মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। মানবিক অধিকারকে স্বীকার করতে গেলে তাই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে , ও এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে হবে। **ভূসম্পত্তি , শিল্প , বাণিজ্য সব কিছুর সাধারণীকরণ** এই বিপ্লবের একটি অতিবৃহৎ অঙ্গ। এ ক্ষেত্রে ' রাষ্ট্রীকরণ ' শব্দটি আমি ইচ্ছা করেই বললুম না। জমির মালিক জমিদার নয় , কারখানার মালিক তথাকথিত শিল্পপতিও নয় — একথাগুলো যতখানি সত্য " লাঙ্গল যার জমি তার " , " হাতুড়ী যার কারখানা তার " —একথাগুলোও ঠিক ততখানি অসত্য। সব কিছুরই মালিক বিশ্বের জনসাধারণ আর তাই ' সাধারণীকরণ ' শব্দটাই ব্যবহার করলুম। এই ব্যষ্টিগত মালিকানা - ব্যবস্থার বিলোপের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের কেউ কেউ বলেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েই জমি -

জমা , কল - কারখান তথা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল করা উচিত । কারও মতে ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক পুঁজিপতিরা এ যাবৎকাল যথেষ্ট শোষণ করেছে , তাই ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠতে পারে না । দীর্ঘকাল ধরে ক্ষতিপূরণের টাকা জোগাতে গেলে জনসাধারণের দ্রুত কল্যাণ বিধান সম্ভব নয় — একথাটা খুৰই সত্য । তাই মূল্য দিয়ে পুঁজিবাদীর সম্পত্তি কিনে নেবার প্রস্তাব সমর্থন করা যায় না । কিন্তু এ কথাটাও তো ঠিক যে এই সকল সম্পদের মালিক সর্বক্ষেত্রে সুস্থ সবল বা ধনী নন্ । হতে পারে সম্পত্তির মালিক ছিলেন একজন অসহায়া বিধবা বা একজন পঙ্গু অতিবৃদ্ধ । এক্ষেত্রে তাঁদের জন্যে পেন্সনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত । সম্পদের মালিক যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তার ভরণ - পোষণ বা শিক্ষার জন্যে ষ্টাইপেণ্ডও দিতে হবে বৈ কি ! মালিক যদি সুস্থ - সবল পুরুষও হয় সেক্ষেত্রেও তার যদি অর্থোপার্জনের দ্বিতীয় কোন পথ না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্যমত অর্থোপার্জনের সুযোগও তার জন্যে কর দিতে হবে । এইটেই হল মানবোচিত ব্যবস্থা ।

সমাজে বিভিন্ন ধরণের পাপাচারকে দেখে যারা শিউরে ওঠেন আর বলেন , — “ গেল , গেল , সব গেল I ধর্ম গেল , নীতি গেল , সব গেল I তাঁদের বোঝা উচিত এই তথাকথিত “ সব গেল ” কথাটার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সামাজিক অবিচার I

সামাজিক অধিকারগত ব্যাপারে নারীর প্রতি অবিচার করা হয় ৰলে ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা পঙ্গু হয়ে থাকার দরুণ নারী সমাজের একাংশ পতিতাবৃত্তি গ্রহণে ৰাধ্য হয় I পতিতাবৃত্তির কারণ অনেকগুলো হলেও দুটোই তার মুখ্য কারণ I আনন্দমার্গ নারীকে পুরুষেরই সমান মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলে স্বীকার করে নিয়েছে I অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীজাতিকে পুরুষের ওপর যাতে নির্ভরশীল হয়ে না থাকতে হয় তার জন্যে উৎসাহ দিতেও আনন্দমার্গ চায় I দুশ্চরিত্র পুরুষ বুক ফুলিয়ে সমাজে মাতব্বরী করবে আর পতিতা নারী সমাজে সৎভাবে জীবন - যাপনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগ পাৰে না এ ব্যবস্থা ন্যায়ানুমোদিত নয় I সৎভাবে জীবনযাপনেচ্ছু নারীকে সসম্মানে সমাজে স্থান দিতে হবে I

পণ - প্রথা সামাজিক অবিচারের আরেকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ! “ মানুষের সমাজ ” পুস্তকটিতে ৰলেছি এই পণপ্রথার কারণ মুখ্যতঃ দুইটি — একটি অর্থনৈতিক ও আরেকটি নারী - পুরুষের সংখ্যাগত তারতম্য । আর্থিক ব্যাপারে নারীর পুরুষনির্ভরশীলতা কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথার উগ্রতা থাকবে না ৰটে কিন্তু এই কার্যকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে তরুণ - তরুণীদের মধ্যে উন্নত আদর্শবাদ প্রচারেরও প্রয়োজন রয়েছে । আমাদের ছেলেমেয়েরা চাল - ডাল নুন   তেল বা গোরু - ছাগল নয় যে তাদের নিয়ে হাটে - বাজারে দর কষাকষি চলৰে ।

(১৫)

আজকের বিশ্বে শান্তি ’ ‘ শান্তি ’ ৰলে চেঁচানো একটা রীবাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু এ চেঁচিয়ে কোন কাজের কাজ হবে কি ? যে কারণগুলো শান্তিকে বিঘ্নিত করে সেই কারণগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই । ব্যষ্টিগত জীবনে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে শুভৰুদ্ধি ও অশুভৰুদ্ধি বা বিদ্যা ও অবিদ্যার সংগ্রাম । কখনও বিদ্যা জেতে , কখনও বা জেতে অবিদ্যা । সামাজিক জীবনেও এই বিদ্যা - অবিদ্যার সংগ্রাম চলেছে । অবিদ্যার বিরুদ্ধে বিদ্যাকে লড়তে হয় , আর সেই লড়াইয়ে যখন বা যতক্ষণ

বিদ্যা জয়ী থাকে ততক্ষণই থাকে এক বিশেষ ধরণের শান্তি যার নাম দিতে পারি সাত্ত্বিকী শান্তি। ঠিক তেমনি এই লড়াইয়ে যখন বা যতক্ষণ অবিদ্যা জয়ী থাকে তখনও থাকে এক প্রকারের শান্তি। তাকে বলতে পারি তামসী শান্তি। তাহলে দেখতে পাচ্ছি শান্তি জিনিসটা একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব। পরমাশান্তি বা স্থায়ী শান্তি সামূহিক জীবনে আসতে পারে না কারণ এই সৃষ্ট জগৎ যে সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর ক্রিয়ায় বিধৃত সেই ক্রিয়া দু'টির প্রথমটি অবিদ্যাপ্রধানা ও দ্বিতীয়টি বিদ্যাপ্রধানা। দুয়ের অস্তিত্বেই যখন জগতের অস্তিত্ব তখন বিশ্বে স্থায়ী শান্তির অর্থ (স্থায়ী তামসী বা স্থায়ী সাত্ত্বিকী যে শান্তিই হোক না কেন) বিদ্যা বা অবিদ্যা অথবা দু'টিরই অক্রিয়তা। তাই বলতে হয় , বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সামূহিক শান্তি এক সামগ্রিক প্রলয় ছাড়া আর কোন অবস্থায়ই আসতে পারে না। আর এই সামগ্রিক প্রলয়ের কল্পনা যুক্তিবিরোধী। তবে ব্যষ্টিগত জীবনে মানুষ সাধনার দ্বারা অবশ্যই পরমাশান্তি লাভ করতে পারে , আর জাগতিক বিচারে সে অবস্থাকে ৰলতে পারি ব্যষ্টিজীবনের প্রলয়। সরকারী কর্মচারী যেখানে দৃঢ়চেতা , সমাজবিরোধী তামসিক ব্যষ্টিরা সেখানে মাথা নীচু করে থাকে। তখন দেশে থাকে একটা বিশেষ প্রকারের শান্তি। সেটাকে বলতে পারি সাত্ত্বিকী শান্তি। সরকারী কর্মচারীরা যেখানে দুর্বল দেশে তখন চলতে থাকে তামসিক ব্যষ্টিদের

দাপট , সৎব্যক্তিরা মাথা নীচু করে থাকে । সেটাও একটা শান্তির অবস্থা । সেটাকে বলতে পারি তামসী শান্তি । এই তামসী শান্তি নিশ্চয়ই কাম্য নয় । কোন এক বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ মানবগোষ্ঠী যদি সেই অঞ্চলের অথবা বহিঃস্থ কোন অঞ্চলের অন্য এক মানবগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার করে বা হামলা করে সেই অবস্থায় অন্যান্য মানুষেরা যদি নির্বাক হয়ে দেখতে থাকে অথবা আলাপ - আলোচনা , ৰোঝা পড়া বা আপোষ - রফার পথকেই যদি একমাত্র পন্থা বলে মনে করে , বুঝতে হবে তারা তামসী শান্তিকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে ।

কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে যদি মৌখিক খুবই সদ্ভাব থাকে , কিন্তু যদি স্পষ্টই দেখা যায় যে সে তার স্ত্রীকে হত্যা করতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিবেশীদের কী কর্তব্য ? তারা কি সেটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার বলে মুখ বুজে বা হাত গুটিয়ে বসে থাকৰে , ওই নারীর মৃত্যুর পথ সুগম করে দিয়ে তামসী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য দেবে ? না , মানব - ধর্ম সেকথা বলে না । তাদের উচিত দরজা ভেঙ্গে তার গৃহে প্রবেশ করে ওই নারীকে রক্ষা করা ও অত্যাচারী পুরুষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে সাত্ত্বিকী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা । কোন দেশ যদি তার সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যায় বা তার দুর্বল প্রতিবেশীদের উপর হামলা করে , অন্যান্য প্রতিবেশীদের উচিত

প্রয়োজনবোধে অস্ত্রবলের সাহায্যে অত্যাচারকারীকে নিরস্ত করে সাত্ত্বিকী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এগিয়ে আসা। তাই সাত্ত্বিকী শান্তি যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের শক্তির সাধনা করতে হবে। **ছাগলের দ্বারা ব্যাঘ্রের সমাজে সাত্ত্বিকী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।** যাদের মতে অহিংসার অর্থ শক্তির অসম্প্রয়োগ, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তাদের দ্বারা সাত্ত্বিকী শান্তির প্রতিষ্ঠা বা অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা কোনটাই সম্ভব নয়। তাদের অহিংসায় ধাপ্পাবাজী থাকতে পারে, নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও থাকতে পারে কিন্তু তার দ্বারা সাত্ত্বিকী শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে না।

সূচীপত্র

(১৬)

বিশ্ব - ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু - পরামাণুও সকল জীবের এজমালী সম্পত্তি। নীতিগতভাবে এটা মেনে নিতেই হবে, আর এ কথাটা স্বীকার করার পরে এদেশী ও বিদেশী, অমূকের অমূক দেশের নাগরিক হবার যোগ্যতা আছে আর অমূকের নেই অথবা রাষ্ট্রীয় অধিকার অমূক সম্প্রদায় এতখানি, তার চাইতে কম পাৰে বা পাৰেনা — এ ধরণের

কথাগুলো আর বলা চলে না। বস্তুতঃ এ ধরণের কথায় উৎকটভাবে কায়েমী স্বার্থবাদই ফুটে ওঠে। একদেশের মানুষ ভূমির অভাবে বা খাদ্যের অভাবে ক্লেশ পাক , অন্যদেশে থাকুক প্রচুর পতিত জমি বা প্রচুর খাদ্য— এ অবস্থাটাও এক ধরণের পুঁজিবাদ ছাড়া আর কী ! জন্মগত সূত্রে সকলেরই সর্বত্র যাবার , বাস করবার ও মানুষের মত খেয়ে - পরে বাঁচবার অধিকার আছে। যদি কোন দেশের কোন মানব - গোষ্ঠী জীবের এই মৌলিক অধিকারটুকু মেনে নিতে রাজী না হয়ে থাকে বুঝতে হবে তাদের মুখের শান্তির বুলি নিছক একটা লোক - ভোলানো ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু এই ছোট্ট পৃথিবী নয় , বিশ্ব - ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ - উপগ্রহ , নক্ষত্র , উল্কা - নীহারিকা সব কিছুতেই মানুষের ঘর রয়েছে। যদি কেউ মানুষকে তার এই জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চায় মানুষকে শক্তিবলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। “ **সব দেশে মোর দেশ আছে , আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।** ”

(১৭)

সামগ্রিক দৃষ্টির অভাবই অধিকাংশ অনর্থের মূল। সবল মানুষ দুর্বলের ওপর করে চলেছে অত্যাচার - অবিচার। সবল মানব - গোষ্ঠী

দুর্বল মানবগোষ্ঠীর ওপর করে চলেছে শোষণ। এ অবস্থায় সৎ মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। নৈতিক উপদেশ কৰে কাজ দেবে তার জন্য অনন্তকাল বসে থাকা চলে না। তাই সৎব্যষ্টিগণকেও সংঘবদ্ধ হতে হবে। দানৰের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতিও চালিয়ে যেতে হবে। সামূহিক জীবনের ওপর অথবা কোনো মানব - গোষ্ঠীর ওপর যারা নির্যাতন চালায় তাদের ক্ষমা করা চলে না। সে ক্ষেত্রে ক্ষমা শুধু দুর্বলতাই নয়, তাতে অন্যায় প্রশ্রিত হয় — অন্যায়কারী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ব্যষ্টিগত জীবনে কোন নির্দোষ ব্যষ্টির ওপর অসাধুরা যদি জোর জুলুম চালায় সেক্ষেত্রে ওই নির্দোষ ব্যষ্টি নিজের সহাশক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে অথবা অন্য যে কোনো কারণে জুলুমৰাজকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করলেও করতে পারে। কিন্তু ওই জুলুমৰাজেরা যদি কোনো মানব - গোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার চালায় সে ক্ষেত্রে ওই গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে কোনো ব্যষ্টিবিশেষ অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে পারেন না, ক্ষমা করবার অধিকার তাঁর নেই। তিনি যদি নিজের অধিকার বহির্ভূত কাজ করেন সেক্ষেত্রে তিনি যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারাই তাঁকে ধিক্কার দেবে। তাই বলতে হচ্ছে **ক্ষমা ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা — সামূহিক জীবনের নয়।**

(১৮)

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের মন যত উদার বা পরিব্যাপ্ত হতে থাকে ততই সে উপজাতীয় মনোভাব , সাম্প্রদায়িকতা , প্রাদেশিকতা প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠতে থাকে । অনেককে বলতে শুণি জাতীয়তাবাদ (nationalism) জিনিসটা বেশ ভাল — তাতে কোনো সংকীর্ণতা নেই । কিন্তু কথাটা কি ঠিক ? উপজাতীয়তা , সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতার মত জাতীয়তাবাদও একটি আপেক্ষিক তত্ব । কোথাও এর মূল্য উপজাতীয়তা , সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতার চাইতে বেশী , কোথাও বা কম । দুষ্টান্তস্বরুপ ধরা যাক পর্তুগীজ জাতীয়তাবাদের কথা । একজন জাতীয়তাবাদী পর্তুগীজের মানস বিষয় যতটা বড় অর্থাৎ যতজন লোকের কল্যাণ কামনায় সে রত সেই তুলনায় একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানের মানসবিষয় অবশ্যই বৃহত্তর । কারণ সে অধিকতর সংখ্যক মানুষের কল্যাণকামী যেহেতু পৃথিবীতে পর্তুগীজ অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৰেশী । এ অবস্থায় একজন জাতীয়তাবাদী পর্তুগীজের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানের মনোভাবের নিশ্চয়ই নিন্দা করতে পারি না । অনুরুপভাবে একজন জাতীয়তাবাদী পর্তুগীজের চাইতে একজন জাতিবাদী (casteist) রাজপুতের মনোভাবকে

অধিকতর উদার বলেই মেনে নিতে হবে কারণ তার মধ্যে অধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণবীজ নিহিত রয়েছে। জাতীয়তাবাদী পর্তুগীজের চাইতে একজন প্রাদেশিকতাবাদী অন্ধের মনোভাবকেও অধিকতর ব্যাপক ৰলে মেনে নিতে হবে। যদি কোনো ব্যষ্টি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে নিয়ে প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেয় তবে তার মনোভাবকে পৃথিবীর অধিকাংশ নেশনের (পৃথিবীর অধিকাংশ নেশনই জনসংখ্যায় ৰাঙালীদের চাইতে কম) জাতীয়তাবাদী মনোভাবের চেয়ে উন্নততর বলেই স্বীকার করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জাতিবাদ (casteism) , সাম্প্রদায়কিতাবাদ , প্রাদেশিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ (nationalism) সবগুলোই একই ধরণের জিনিস। যে যেটাকে নিয়ে বাজার জমিয়ে বসেছে সে সেটার পক্ষেই ঢাক পেটায়। আসলে এগুলোর প্রত্যেকটাতেই ইজ্‌মের দোষ আছে , সংকীর্ণতা , হিংসা , দ্বেষ , নীচাশয়তা সব কিছুই পুরোমাত্রায় রয়েছে। আমার তোমার ভেদ রেখে যারা জনকল্যাণে নামে তারা তাদের কার্যের দ্বারা মানব - সমাজের ভেদবুদ্ধির ফাটলগুলোকেই আরো বাড়িয়ে দেয়। জীবমাত্রকেই ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে থেকে জীব হিসেবে দেখে যারা তাদের কল্যাণ করতে চায় তাদের পক্ষে বিশ্বৈকতাবাদকেই (universalism) মনে - প্রাণে গ্রহণ করা ছাড়া

গত্যন্তর নেই। বিশ্বৈকতাবাদকে বাদ বা ইজ্‌ম্‌ বিশেষণে বিশিষ্ট না করাই উচিত কারণ এতে ইজ্‌মের কোনো লক্ষণই নেই। সৰকিছুকেই আপন বলে গ্রহণ করলে " পর " বলতে আর কেউই থাকে না। তাই হিংসা , দ্বেষ , সঙ্কীর্ণতার অবকাশও থাকে না।

(১৯)

দিন যত এগিয়ে চলেছে মানুষের কাছে ততই জাতিবাদ , প্রাদেশিকতাবাদ , সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদের (nation alism) জৌলুস ফিকে হয়ে আসছে। আজকের মানুষকে বুঝতে হবে যে অদূর ভবিষ্যতে তাকে বিশ্বৈকতাবাদ গ্রহণ করতেই হবে। সমাজ - কল্যাণকৃৎকে তাই সাম্প্রদায়িক বা জাতীয়তাবাদী (nation alist) সংস্থা গড়বার পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে নিজের সকল শক্তি ও ৰুদ্ধি বিশ্ব সংস্থা গড়ার প্রচেষ্টাতেই লাগাতে হবে। কূটনীতি আর ভাঁওতা - দেওয়া ভাষণ ছেড়ে দিয়ে সরলভাবেই রচনাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

অনেকে বলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থগুলি বিশ্বসংস্থা বা বিশ্বরাষ্ট্র রচনার পক্ষে একমাত্র অন্তরায় তো নয়ই বরং একটা গৌণ অন্তরায়। আসল কারণটা হচ্ছে স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্ব

খোয়াবার ভয় । বিভিন্ন দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে তাদের আজ যে প্রচণ্ড প্রতাপ বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে সে প্রতাপটি আর থাকবে না ।

বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা জনসাধারণের সন্দেহ বিশ্বরাষ্ট্র রচনায় ৰাধা দিতে পারে ! মানুষের মনের অকারণ ভয় দূর করবার জন্যে তাই এ কাজে ধীরে ধীরে এগোতে হবে ও সম্ভাব্য ৰাধাগুলি দূর করবার জন্যে খোলা মন নিয়ে বিচার করতে হবে । বিশ্বরাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে শক্তিমান করে তুলতে হবে — হঠাৎ নয় । যেমন ধরা যাক্ এর পরিচালনার জন্যে অনির্দিষ্টকালের জন্যে দু'টি পরিষদ রাখা যেতে পারে । নিম্নতন পরিষদটি বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া হবে । ঊর্ধ্বতন পরিষদে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রগত ভাবে । এতে সুবিধা হবে এই যে জনসংখ্যা কম থাকায় যে সকল দেশ নিম্নতন পরিষদে একটি সদস্যও পাঠাতে পারবে না , তারা ঊর্ধ্বতন পরিষদে সদস্য পাঠিয়ে বিশ্বজন সমক্ষে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারবে । নিম্নতন পরিষদে গৃহীত না হলে ঊর্ধ্বতন পরিষদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবেন না ।

তবে নিম্নতন পরিষদের সিদ্ধান্তকে নাকচ করবার অধিকার তার থাক্‌ৰে ।

গোড়ার দিকে এই বিশ্বরাষ্ট্র কেবল মাত্র আইন - প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবেই কাজ করে যেতে পারে । কোন আইনের কোন বিশেষ অঞ্চলে সাময়িকভাবে প্রয়োগ বা অপ্রয়োগ সম্বন্ধেও সিদ্ধান্তে পৌঁছবার অধিকার এই বিশ্বরাষ্ট্রেরই থাকৰে । বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রগুলির হাতে থাকে কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা । আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হাতে না থাকায় খেয়াল খুশী মত , ভাষাগত , রেলিজনগত বা রাজনীতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম চালানো তাদের পক্ষে একটু অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াৰে ।

[সূচীপত্র]

(২০)

যান্ত্রিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশকালের ওপর মানুষের আধিপত্য ক্রমশই ৰেড়ে যেথে থাকৰে । আর তাই একটি বিশ্বরাষ্ট্রের প্রয়োজনও মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করৰে । ক্রমশ মানুষকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে বেশী পরিমাণে মেলা মেশা করতে হবে ও এই মেলা - মেশার খাতিরে একে -

অন্যকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টাও করতে হবে । মানুষজাতের অজস্র ভাষা । প্রতিটিই আমাদের ভাষা — আমাদের সকলকার ভাষা । এখানে " আমার ভাষা – তোমার ভাষা " বা " দেশী - ভাষা বিদেশীভাষা " ' –এ জাতীয় মনোভাব অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ । এতটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে আমাদের অনেকগুলি ভাষা আছে , তবে তার মধ্যে মাত্র একটি বা কয়েকটি ভাষায় আমি নিজেকে ব্যক্ত করতে পারি ।

মর্যাদাগত বিচারে বিশ্বের প্রতিটি ভাষা সমান হলেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুবিধার জন্য মানুষকে একটি সাধারণ ভাষা নির্বাচন করে নিতে হবে । **সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে বিশ্বের সর্বত্রই যে ভাষাটির প্রচার রয়েছে , তেমনি একটি ভাষাকেই বিশ্ব - ভাষা রূপে গ্রহণ করতে হবে ।**

যতদিন বিশ্ব - রাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বের ওপর পুরো রাষ্ট্রিক অধিকার না পাচ্ছে ততদিন বিশ্বের বিভিন্ন অংশের স্থানীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সুবিধামত ওই বিশ্ব - ভাষাটা অথবা কোনো স্থানীয় ভাষাকে নিজেদের সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করতে

পারে । যে রাষ্ট্র সরকারী ভাষা রূপে যে ভাষাকেই গ্রহণ করুক না কেন বিশ্ব - ভাষার পঠন - পাঠনে কোথাও কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিত হবে না । আমরা কিছুতেই অবশিষ্ট দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁটে ফেলে দিয়ে কূপমণ্ডুক হয়ে ৰসে থাকতে পারিনা , জাতীয়তাবাদের (nationalism) নাম করে বিশ্বের অবশিষ্ট ভাই - বোনদের থেকে দূরে থেকে অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরতে পারিনা ।

বর্তমান কালে **ইংরেজী বিশ্ব - ভাষা** হলেও সকল ভাষারই জন্ম ও মৃত্যু আছে । সুতরাং অনন্ত কালের জন্যে ইংরেজীই যে বিশ্ব ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকৰে একথা বলা চলে না । যে যুগে বিশ্ব জনের মধ্যে যে ভাষার বেশী প্রচার দেখা যাৰে সে যুগে সেই ভাষাকেই বিশ্ব - ভাষা বলে মেনে নিতে হবে ।

(২১)

বিশ্ব - জনের সাধারণ সুবিধার জন্যে একটি বিশ্ব - ভাষার প্রয়োজন যতখানি , একটি সাধারণ বিশ্ব - লিপির প্রয়োজন সে তুলনায় কিছুই নয় । তবে হ্যাঁ , পৃথিবীর বিভিন্ন

ভাষা একই লিপিতে লিখিত হলে ভাষা শিক্ষায় যে কিছুটা সুবিধা হবে একথা অনস্বীকার্য । বিশ্বের প্রচলিত লিপিগুলির মধ্যে রোমান লিপিই সব চেয়ে বেশী বিজ্ঞানসম্মত । তবে প্রচলিত সমস্ত ভাষাতে এই লিপির ব্যবহার করতে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা দেখা দেবে । তাছাড়া স্থানীয় লিপিগুলির প্রতি মানুষের একটা দুর্বলতাও আছে । আমার মনে হয় বিভিন্ন ভাষায় রোমান লিপি গ্রহণ করা বা না - করাটা সেই ভাষা-ভাষী জন - গোষ্ঠীর ওপরে ছেড়ে দেওয়াই ভাল । তবে **বিশ্ব লিপি হিসেবে রোমান লিপিটি যত বেশী সংখ্যক লোক চিনে নেয় ততই ভাল ।**

যে যুগে যে ভাষাটি বিশ্ব - ভাষা হবে সে যুগে সে ভাষায় প্রচলিত লিপিটিকেই যে বিশ্ব - লিপি বলে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই । বরং যে যুগে যে লিপিটি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞান - সম্মত বলে বিবেচিত হবে সেটিই হবে বিশ্ব - লিপি ও তৎকালীন বিশ্ব ভাষার পঠন - পাঠন সেই বিশ্ব লিপিতেই হবে ।

বিশ্ব - ভাষার তুলনায় বিশ্ব - লিপির প্রয়োজন অনেক কম , আর বিশ্ব - পোশাকের কোনো প্রয়োজনই নেই। শুধু বিশ্ব - পোশাক কেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় পোশাক বলেও কোন কিছু থাকা আমার মতে অবাঞ্ছনীয় ।

মানুষ তার পোশাক নির্বাচন করে স্থানীয় জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিকতা বুঝে নিজের শারীরিক ও পেশাগত প্রয়োজনের কথা ভেবে। সুতরাং কারও পোশাক সম্বন্ধে কোন রকমের মন্তব্য না করাই ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি পূর্বভারত ও পূর্বপাকিস্তানের স্বাভাবিক পোশাক লুঙ্গি - ধুতি ও পাঞ্জাবী , কিন্তু কল কারখানায় কাজ করবার সময়ে পূর্বভারতের লোকেরা প্রয়োজনের তাগিদেই প্যান্ট পরে থাকে। ঠিক তেমনি উত্তর পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের খানদানী পোশাক পায়জামা - শেরওয়ানী হলেও এ অঞ্চলের কর্ষকেরা জমিতে লাঙ্গল ঠেলবার সময় সে পোশাক পরে না। এই অবস্থায় কোন পোশাকটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মানুষ জাতের সংস্কৃতি একটাই। অনেক কালচারের কথা আমি মানতেই রাজী নই। হ্যাঁ, তবে এই মাত্র বলা যেতে পারে যে মানুষ জাতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নাচে - গানে উষ্চারণে তথা উৎসবাদি অনুষ্ঠানে স্থানীয় বৈচিত্র্য আছে। এ স্থানীয় বৈচিত্র্য বা আচার ব্যবহারের তারতম্যকে সংস্কৃতিগত ভেদ ৰলে মেনে নেওয়া চলে না।

মানুষের এই যে আচার ব্যবহারগত স্থানীয় ভেদগুলো এগুলো আইন কানুনের জোরে বা ডিক্টেক্টরী শাসন চালিয়ে দূর করা চলে না। আচার - ব্যবহার, ভাষা তথা অন্যান্য স্থানীয় রীতি - নীতিগুলিকে রাষ্ট্রিক ঐক্য, মানবিক ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের নামে ধ্বংস করতে গেলে তার ফলে পারস্পরিক হিংসা ও অবিশ্বাসই দানা বাঁধতে থাকবে যা সামূহিক জীবনকে অকল্যাণের পথেই নিয়ে যাবে। **আমি সামাজিক সংশ্লেষণের** পক্ষপাতী। আমার মতে মানুষ যত ঘনিষ্ঠভাবে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মিশবে, পৃথিবীর একটি কোণ অন্য কোণের কাছে যত বেশী এগিয়ে আসবে আচার - ব্যবহারের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ততই পারস্পারিক মেলা - মেশার ফলে নূতনতর রূপ সৃষ্টি করতে থাকবে— বিভিন্ন বাগানের ফুল একত্রে এসে ফুলের তোড়ায় পরিণত হবে। তোড়ার সৌন্দর্য ফুলের সৌন্দর্যের চাইতে কিছু কম নয়, বরং বেশীই। ধ্রুপদ পরিণত হৰে খেয়ালে, রাগসঙ্গীত

পরিণত হবে কীর্তন , বাউল , ভাটিয়ালী , জারী আর দরবেশীতে । বিভিন্ন দেশ বা তথাকথিত বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা যদি সামাজিক মেলা - মেশা বা পারস্পারিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দেখায় তার ফলে প্রতি অল্পকালের মধ্যে এই সামাজিক সংশ্লেষণ সংসাধিত হতে পারে ।

কসমোপলিটান (cosmopolitan) শহরগুলিতেও আমরা এর সার্থকতা কিছু কিছু দেখতে পাই ।

সূচীপত্র

(২৪)

পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে । অনেকেই এতে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন । পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এজন্যে শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে । যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানেই জনগণের অধিকতর দারিদ্র্য । কিন্তু সামূহিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই । সামগ্রিক জনসংখ্যার আহার্য বা বাসস্থানের টান পড়লে তারা মিলিত প্রচেষ্টায় অনাবাদী অঞ্চলে নূতন শস্যক্ষেত্র গড়ে তুলবে , বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবে , রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটি - জল - বায়ু থেকে মানুষের

খাদ্য তৈরী করবে ও পৃথিবী যদি একান্তই কৃপণা বলে গণ্যা হয় তাহলে ভূমিসন্ধানী মানুষের দল বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের দিকে ছুটে যাবে। তবে হ্যাঁ , যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজও চালু আছে সেখানে ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক অনটন এড়াবার জন্যে কেউ যদি জন্মশাসন ব্যবস্থার আশ্রয় নেয় তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু থাকে না। তবে পুরুষ বা নারীর শারীরিক বিকৃতি এনে বা তাদের প্রজননশক্তি স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দিয়ে জন্ম - নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ তাতে করে তাদের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তেই উৎকট ধরণের মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

(২৫)

বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ... এগিয়েই চলেছে .... এগিয়ে যাবেও। বিজ্ঞানের নিন্দা করে , কেউ তার অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না। যে সে ধরণের চেষ্টা করতে যাবে সে নিজেই পেছিয়ে পড়বে — বর্তমান জগৎ থেকে ৰাতিল হয়ে যাবে। মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের আয়ুকে অবশ্যই দীর্ঘায়িত করতে পারবে। কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে মৃতদেহে প্রাণ - সঞ্চারও করতে পারবে। বিজ্ঞানের সে সুদিনকে ত্বরান্বিত করবার প্রচেষ্টা অবশ্যই জীবসেবার

একটা অঙ্গ। একদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেই মানুষ মানব - শিশুকে তৈরী করতে শিখবে। তখন হয়তো অর্ডার দিয়েই মানুষ নিজের অর্ডার মত , পছন্দ মত সন্তান পাৰে। সেই গবেষণাগার - শিশুরা (laboratory babies) আজকের মানুষের চাইতে বুদ্ধিবৃত্তিতে সাধনায় অধ্যাত্ম সম্পদে কেনইবা পেছিয়ে থাকৰে ! আজকের বিজ্ঞান - বিরোধীরা বলে থাকে " মানুষ জীবিত বস্তু তৈরী করুক দেখি ! " সেদিনকার মানুষ তা তৈরী করে মুখের মত জবাব দেবে। প্রজ্ঞার বিকাশ সে কালের মানুষকে অধিকতর অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন করে তুলবে। সগুণব্রহ্ম আজ প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ করে চলেছে , পৃথিবীতে তাঁর সেই কাজের অধিক থেকে অধিকতর অংশ ক্রমশঃ মানবীয় আধারের মাধ্যমে হতে থাকৰে। তখনকার দিনে মানবদেহের প্রজননশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাৰে।

(২৬)

মানবীয় ঐক্যে যারা ৰাধা দিচ্ছে বা ৰাধা দেবার চেষ্টা করে তাদের মধ্যে **দলীয় রাজনীতি** অন্যতম। বস্তুতঃ এই দলীয় রাজনীতি জিনিসটা রোগজীবাণুর চাইতেও ভয়ঙ্কর। এতে ধীরে ধীরে মানব মনের সমস্ত সুকুমারবৃত্তি , সমস্ত সরলতা তথা সেবাপরায়ণতা

সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যায় । এতে ব্যষ্টির যোগ্যতার চাইতে দলীয় তকমার মর্যাদা ৰেশী , জনসেবা নয়— আত্মসেবাই প্রধান লক্ষ্য , কল্যাণ নয় — মন্ত্রিত্বই বড় , জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া ডিগ্রাজী খাওয়া এগুলো খুবই সাধারণ জিনিস । নিজেকে সংশোধন করবার চেষ্টা না করে এরা কেবল বচনবাগীশতার দ্বারাই সবকিছু করে ফেলতে চায় । জনসাধারণের দুর্বলতাগুলো বুঝে বড় বড় বুলি কপচিয়ে জনসাধারণের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে এরা রাষ্ট্রের গদী দখল করতে চায় বা কায়েম রাখতে চায় । মানুষকে এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে । সমাজ জীবনে , ধর্ম - জীবনে , শিক্ষা - ক্ষেত্রে , সাহিত্য - ক্ষেত্রে সর্বত্রই এরা নাক গলাতে চায় । জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতা কেবল যে বক্তৃতামঞ্চে বড় বড় বুলি আউড়ে গিয়ে অর্জন করা যায় না — ক্ষমতার মোহে এ কথাটা তারা ভুলে থাকতে চায় ।

সূচীপত্র

সৎ তথা জনকল্যাণকামী ব্যষ্টিদের তাই দলীয় রাজনীতি থেকে সযত্নে দূরে থাকা উচিত। প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে দলীয় রাজনীতি না থাকলে সৎ ব্যষ্টিরাও এককভাবে রাষ্ট্র - গঠনে বা রাষ্ট্র - সেবায় সাফল্য লাভ করতে পারবে কি ? তাদের মধ্যে সংঘদ্ধতার প্রয়োজন কি একেবারেই নেই ? এর জৰাৰে আমি ৰলৰ যারা সৎ , যারা সত্যিকারের জনকল্যাণকামী , যারা বিশ্ব - রাষ্ট্রের তথা ‘ আনন্দ - পরিবারের ’ আদর্শে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব থাকতেই হবে। নিছক মিলিতভাবে জনসেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে (দল পাকাবার উদ্দেশ্যে নয়) এঁরা বোর্ড গোছের কোনো কিছু গড়ে নিতে পারেন। কিন্তু বোর্ডের পক্ষ থেকে বোটাবুটি [voting] প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা উচিত হবে না। লোকে বোট দেৰে যোগ্য মানুষকে — দলে টিকিট আঁটা ল্যাম্প পোষ্টকে নয়। দলীয় রাজনীতি প্রকাশ্যে যেগুলোর বিরোধিতা করে , গোপনে গোপনে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সেগুলোকে প্রশ্রয় দেয়। সাম্প্রদায়িকতা , প্রাদেশিকতা , জাতিবাদ , দলীয় স্বার্থের খাতিরে এগুলো কেউই খারাপ নয়। মানুষের একমাত্র পরিচয় যে সে মানুষ বা জীব। দলীয় রাজনীতি একথাটা ভুলিয়ে রাখতে চায় — দলীয় স্বার্থের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দিয়ে মানুষের মানস - সম্পদকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিতে চায়। .

(২৮)

সৃষ্টি যতদিন আছে বিদ্যা ও অবিদ্যার সংগ্রাম চলবেই। আধ্যাত্মিকতা - বিমুখ রাজনীতিকরা বক্তৃতামঞ্চে বড় বড় বুলি কপচিয়ে বা শাদা পায়রা উড়িয়ে দিয়ে সে সংগ্রাম বন্ধ করতে পারবে না। অবিদ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে মানুষকে শক্তিশালী হতে হবে। এ ব্যাপারে অস্ত্রশক্তি , মানসিক শক্তি ও অধ্যাত্ম - শক্তি তিনেরই প্রয়োজন। কপটাচারণই যাদের পেশা অধ্যাত্ম - সাধনা তারা করবে না। স্বার্থের তাগিদে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বড় বড় লেক্‌চার দিলেও জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে এরা পারবে না — সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা এদের নেই। ভাঁওতাৰাজীতে তিক্ত - বিরক্ত হয়ে জনসাধারণ এই ধরণের নেতাদের কাছ থেকে মানসিক সম্পদেরও কোনো উপকরণ পাৰে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হবে কেবল অস্ত্র - ৰলেরই ওপর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে , কেবল পশুশক্তিই এই সকল রাজনীতিকের একমাত্র ভরসা।

সূচীপত্র

(২৯)

দলীয় রাজনীতির ধাপ্পাৰাজীতে জনসাধারণকে সাময়িক ভাবে বিমূঢ় করে ফেলা যায় । বিশেষ করে এই ধাপ্পাবাজেরা যদি ভাল বক্তা হয় । বক্তৃতার জোরেই তারা তাদের কৃত কর্মের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে । দেখা যায় দলীয় স্বার্থ তথা প্রতিষ্ঠা ৰজায় রাখবার জন্যে রাজনীতিকেরা কোটি কোটি মানুষের ক্লেশের কারণ হতেও কুণ্ঠা বোধ করে না । কর্তব্যের খাতিরে জনসাধারণের হয়তো উচিত অপরাধী নেতৃবৃন্দকে impeach (আদালতে বিচার) করা । কিন্তু দলীয় স্বার্থের ধ্বজাধারীরা অল্পবুদ্ধি জনসাধারণের কাছে গরমা - গরম দু - চারটে কথা শুনিয়ে দিয়েই তাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা - সমৃদ্ধির সবকিছুকেই ছিন্ন - ভিন্ন করে দেয় । বিভিন্ন ধরণের উদ্ভট উদ্ভট ভাব জনসাধারণের মনের মধ্যে তাল - গোল পাকাতে থাকে — তারা তাদের বক্তব্য হারিয়ে ফেলে ।

(৩০)

বিদ্যা - অবিদ্যার সংগ্রাম চিরকালই চলবে । সুতরাং কম - ৰেশী পুলিশ - মিলিটারীর প্রয়োজন চিরদিনই থাকৰে । তবে হ্যাঁ , বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সে প্রয়োজন কমে যাৰে । বিদ্যা - অবিদ্যার সংগ্রাম

থাকায় শ্রেণী - সংঘাত কম - বেশী চিরকালই চলবে। তাই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে হাত - পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে আয়েসের সঙ্গে ঘুমোৰে— এ ধরণের কল্পনা যারা করে থাকেন , তাঁ দিকে হতাশ হতে হবে।

(৩১)

দলীয় রাজনীতির হাত থেকে শিক্ষা - ব্যবস্থাকে সযত্নে মুক্ত রাখা দরকার। **শিক্ষা - ব্যবস্থার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের কিন্তু পঠন - পাঠন , পাঠরীতি তথা পাঠ্য - নির্বাচনের একচ্ছত্র অধিকার শিক্ষাব্রতীদেরই থাকা উচিত।** রাষ্ট্র এই শিক্ষাব্রতীগণকে বা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দিতে পারে — হুকুম করতে পারে না , কোনো প্রস্তাব বিচার বিবেচনার জন্যে পাঠাতে পারে— গ্রহণ করতে চাপ দিতে পারে না। বেতার - ব্যবস্থা , সিনেমা প্রভৃতি যে সকল জিনিসের লোকশিক্ষামূলক গুরুত্ব আছে সেগুলি সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। এগুলোকে দলীয় স্বার্থের জয়ঢাকে পরিণত হতে দেওয়া যায় না।

(৩২)

প্রশ্ন উঠতে পারে বিশ্বরাষ্ট্র তথা " আনন্দ পরিবারের " প্রতিষ্ঠা কি বিনা সংগ্রামেই হৰে ? এর জবাবে ৰলৰ হ্যাঁ , যারা

বিশ্ব রাষ্ট্রের বা “ আনন্দ পরিবারের ” প্রতিষ্ঠা চায় তাদের প্রাণশক্তিকে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ফেলে না দিয়ে অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম না করে **কেবল সেবার মাধ্যমেই , কেবল রচনাত্মক কাজের মাধ্যমেই মানুষ - জাতের এই চরম সামাজিক কল্যাণ সাধিত হবে** । নিষ্ঠার সঙ্গে জনসেবা করে যেতে হবে মনের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য না রেখে । যে সকল রাষ্ট্র জনসেবার কাজে এসকল সেবাব্রতীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বুঝতে হবে তারা বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তথা ‘ আনন্দ পরিবারেরই স্থাপনা চায় । যে সকল রাষ্ট্র সহযোগিতা করবে না সেখানকার জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে ও এই বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বরাষ্ট্র তথা ‘ আনন্দ পরিবার ’ গড়ে তুলবে । সেবাব্রতীদের এজন্যে দলীয় রাজনীতির নোংরামির মধ্যে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই ।

সমাজকে যাঁরা রোগমুক্ত করতে চান প্রতিটি মানুষের দিকেই তাঁদি’কে দৃষ্টি দিতে হবে । ব্যষ্টির শুদ্ধিতেই সমষ্টির শুদ্ধি হবে অন্যথায় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে লম্বা - চওড়া বক্তৃতা দিয়ে সমষ্টি জীবনের মানোন্নয়ন সম্ভব নয় । একমাত্র মানসিক ও

আধ্যাত্মিক শিক্ষাই সবিপ্র গড়ে তুলতে পারে । এই সদ্‌বিপ্র তাঁদি'কেই বলব যারা যম - নিয়মে প্রতিষ্ঠিত – যারা ভূমা ভাবের সাধক ।

রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতামঞ্চ থেকে গলাৰাজী করে সদ্‌বিপ্র তৈরী করতে পারবেনা— এজন্যে চাই সাধুতা , চাই অন্তঃশুদ্ধির অনুশীলন। তাছাড়া এসকল মঞ্চ থেকে ভাষণ দেয় কারা ? দলীয় রাজনীতি নিয়ে যারা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে তারা না ? – তাদের অধিকাংশই তো , ক্ষমতার মোহে অন্ধ। তারা আবার মানুষকে শেখাবে কী ? অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ ?

[সূচীপত্র](#)

৩৩

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে চরম বা পরম বলে স্বীকার করা চলে না। তবে মানুষ এ ব্যাপারে যতগুলো ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পেরেছে তার মধ্যে গণতন্ত্রকে মন্দের ভাল বলা যেতে পারে। ভবিষ্যতে এর চাইতে ভাল অন্য কোনো ব্যবস্থা পাওয়া গেলে তাকে অন্তরের সঙ্গে মেনে নেওয়াই মানুষের উচিত কাজ হৰে।

গণতন্ত্রের অনেকগুলি দোষ - ত্রুটিই মানুষের চোখে ধরা পড়েছে ও মানুষ সেগুলি শোধরাবার কাজেও হাত লাগিয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক সংখ্যক বোটপ্রাপ্তিই ব্যষ্টির যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এই যোগ্যতা সর্বত্রই যথাযথ ভাবে যাচাই করে নেওয়া হয় না। আমার মনে হয় যিনি সর্বাধিক বোট পেয়েছেন তাঁর পক্ষে প্রদত্ত বোটের সংখ্যা মোট প্রদত্ত বোটের অর্ধেকেরও কম হলে তাঁর জন্যে পুনরায় জনপ্রিয়তার পরীক্ষা হওয়া উচিত। এই পরীক্ষায় তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে বোট নেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পক্ষে যদি ৰেশী বোট পড়ে তখনই তিনি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন।

কোন প্রার্থীকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষিত করা হৰে না। বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোকেরা টাকার লোভ দেখিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করতে পারেন। তাই যেক্ষেত্রে দেখা যাৰে নির্বাচনপ্রার্থী মাত্র একজনই থেকে যাচ্ছেন সে ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তার পরীক্ষা করতে হবে। উক্ত পরীক্ষায় তিনি পরাজিত হলে তাঁকে ও মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারকারিগণকে ওই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে অর্থাৎ তাঁদিকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আসন - সংরক্ষণ বিধিটি যদিও গণতান্ত্রিক নিয়মবিরোধী তবুও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্যে সামায়িকভাবে আসন - সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখলেও রাখা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় অনগ্রসর গোষ্ঠীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যষ্টি খুব কমই থাকে। তাই সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার কোনো গোষ্ঠী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তবে ওই সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের প্রাথমিক নির্বাচন কালে কেবল মাত্র যে জনগোষ্ঠীর জন্যে আসনটি সংরক্ষিত তাদেরই বোট দেবার অধিকার থাকবে। এইভাবে তাঁরা একটি আসনের জন্যে প্রাথমিক নির্বাচনে দু'জন ব্যষ্টিকে মনোনীত করতে পারেন , পরে সর্বসাধারণের বোটে ওই দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন। প্রাথমিক নির্বাচনে যদি একজন ব্যষ্টিই মনোনীত হন অর্থাৎ অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকেন সেক্ষেত্রে সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার পরীক্ষা করতে হবে। আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা যদি কোনো অনগ্রসর বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্পষ্ট ভাষায় দাবী করে তবেই রাখতে হবে— অন্যথায় নয়।

নির্বাচন - প্রার্থীকে লিখিতভাবে নিজের নীতি ঘোষণা করতে হবে I নির্বাচিত হবার পর যদি দেখা যায় তিনি ওই নীতিবিরোধী কাজ করেছেন সেক্ষেত্রে আদালতে তার সত্যতা প্রমাণিত হলে তাঁর নির্বাচনও নাকচ হয়ে যাবে I " প্রাপ্ত বয়স্কের বোটাধিকার " কথাটি শুণতে খুবই ভাল I কিন্তু একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে রাজনৈতিক চেতনাবিহীন ভোটদাতা শাসনযন্ত্রকে দুর্বলই করে দেয় ও সেই জন্যে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ব্যষ্টিদের বোটদানের অধিকার জনস্বার্থের খাতিরে না থাকাই বাঞ্ছনীয় I অশিক্ষিত দেশে গণতন্ত্র একটি প্রহসন মাত্র I সেইসৰ দেশে ৰুদ্ধিমান ধাপ্পাবাজেরা অতি সহজেই অশিক্ষিত ব্যষ্টিদের বোট হাতাতে পারে বা কিনতে পারে I জাতিবাদ বা সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রচার করে , অশিক্ষিত দেশে জনসাধারণকে সহজেই বিভ্রান্ত করা যায় I গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষিত সংবেদনশীল বোট দাতার ওপরে , আর তাই গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনই সর্বাধিক ও সর্বসাধারণের সুবিধার জন্যে এই শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই নিঃশুল্ক হতে হৰে I এই শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় দাপট থাকা উচিত নয় কারণ সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল শিক্ষার মাধ্যমে দলীয় ভাব ধারাই প্রচার করতে থাকৰে I ঘন ঘন সরকার

পরিবর্তন হলে ঘন ঘন শিক্ষাব্যবস্থাও পরিবর্তিত হতে থাকবে। তার ফলে সমগ্র ব্যবস্থাটিই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বৈকতাবাদ ছাড়া অন্য কোনো ইজমই রাখ চলবে না। ছাত্রগণের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগাতে হবে। শ্রদ্ধা ভক্তি - শৃঙ্খলা - নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে হবে— আর শেখাতে হৰে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা যে ছাত্রের জেগেছে কুসংস্কার তার মনে ৰাসা বাঁধতে পারবে না, ইজমের বাগ্‌জাল তাকে বিমুগ্ধ করতে পারবে না — ভবিষ্যৎ জীবনে সদ্‌বিপ্র হৰার যোগ্যতা সে সহজেই অর্জন করে নেৰে।

[সূচীপত্র]

(৩৪)

সমাজচক্র ঘুরে চলেছে। শূদ্র যুগের পরে এসেছে সর্দারদের যুগ অর্থাৎ ক্ষাত্র যুগ, তারপরে বিপ্রযুগ, তারপর বৈশ্য যুগ আর তারপর শূদ্র বিপ্লবের পরে চক্রের দ্বিতীয় পরিক্রান্তিতে আসে নূতন কাত্র যুগ —

যে ক্ষত্রিয়রা শূদ্র বিপ্লবে নেতৃত্ব করেছিল তাদের যুগ। চক্র এইভাবেই ঘুরে চলৰে। নিছক আদর্শবাদ প্রচার করে এর ঘোরা থামানো যাবে না। একটি যুগের পর অপর যুগটি ক্রমবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। একটি যুগের গমনের পরে অন্যের আগমনের নাম দিতে পারি ক্রান্তি। একটির শেষ অন্যটির শুরু এই যুগসন্ধির অবস্থাকে বলতে পারি যুগসংক্রান্তি। শূদ্র - অভ্যুত্থানের পর থেকে পরবর্তী শূদ্র - অভ্যুত্থান পর্যন্ত চক্রের সম্পূর্ণ পরিক্রমণের নাম দিতে পারি পরিক্রান্তি। এক একটি যুগে এক একটি বর্ণ শাসকের ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

এই বিশ্ব , এই সমাজ সকলকারই। এর প্রতিটি ধূলিকণা প্রত্যেকের পৈতৃক সম্পত্তি। তাই কোনো বর্ণ বিশেষের রাজত্ব চলতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। চক্রের পরিক্রান্তি চলবে আর সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে প্রতিটি বর্ণ - অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সবিপ্রের সংগ্রাম। সমাজ সবাইকার , কিন্তু এর অধিনায়কত্ব করবে সবিপ্ররা। ক্ষত্রিয়ের ওপর সমাজের ভার ছেড়ে দিতে পারা যায় না কারণ সে ক্ষত্রিয় - রাজত্ব কায়েম করতে চাইবে — অক্ষত্রিয়কে শোষণ করবে , দুর্বলকে চিবিয়ে খাৰে। বিপ্রের ওপর সমাজের ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না কারণ সে বিপ্র - রাজত্ব কায়েম করতে চাইৰে — অবিপ্রকে শোষণ করৰে ,

ৰুদ্ধিহীনকে চিবিয়ে খাৰে। বৈশের হাতেও সমাজের ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না কারণ তারা বৈশ্য রাজত্ব কায়েম করতে চাইৰে — অবৈশ্যকে শোষণ করবে , মেহন্নতী মানুষকে চিবিয়ে খাবে। শূদ্র সমাজের নেতৃত্ব নিতে পারে না। শূদ্র - অভ্যুত্থানের ফলে শূদ্রের যে জয় হয় সে জয়তিলক ক্ষত্রিয়ের ললাটেরই শোভাবর্ধন করে। ভার দেওয়া যায় সদ্‌বিপ্রের ওপর যাঁরা যম - নিয়মে প্রতিষ্ঠিত — ভূমাভাবের সাধক। সমাজচক্র ঠিকই ঘুরে চলবে। যথাবিধি ক্ষত্রিয় , বিপ্র ও বৈশ্যের অভ্যুত্থানও হৰে। কিন্তু সদ্‌বিপ্রের অধিনায়কত্ব থাকলে ওই অভ্যুত্থানের ফলে তারা সমাজ - জীবনে কিছুটা প্রাধান্য লাভ করলেও কোনো কালেই সর্বময় কর্তা হয়ে বসতে পারবে না। সদ্‌বিপ্ররা কোনো কালেই বিশ্রাম পাবে না। তাদের অক্লান্তভাবেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামই জীবের জীবন। এই সংগ্রাম না থাকলে সৃষ্টিও থাকবে না। সদ্‌বিপ্ররা একাধারে বিপ্র , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য ও শূদ্র , তাই তাদের অধিনায়কত্বের অর্থ হোল সর্ববর্ণের জয়। সূচীপত্র

সকল গতিই সঙ্কোচ - বিকাশী । শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা সঙ্কোচকে আরো সঙ্কুচিত করে দিলে পরবর্তী বিকাশে উল্লম্ফন দেখা দেয় । এই উল্লম্ফিত বিকাশের ফলে সৃষ্ট ক্রান্তিকে বিপ্লব বলাই সঙ্গত । ঠিক তেমনি শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা বিকাশকে দীর্ঘায়িত করে দিলে পরবর্তী সঙ্কোচে অধিক পরিমাণ ঝিমুনি দেখা দেয় ।

শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা কোনো যুগকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলে অর্থাৎ বৈশ্য যুগ থেকে বিপ্র যুগে বা বিপ্র যুগ থেকে ক্ষাত্র যুগে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে বলতে পারি বিক্রান্তি ! অনুরূপ ভাবে পশ্চাদ্দিকে লম্ফনকে বলতে পারি প্রতিবিপ্লব । এই বিক্রান্তি বা প্রতিবিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হয় না ।

বর্তমান পৃথিবীতে দু - একটি অনগ্রসর দেশে আজও ক্ষাত্র যুগ বা বিপ্রযুগ চলছে । অধিকাংশ প্রাগ্রসর দেশে চলছে বৈশ্য যুগ । দু - একটি দেশে শূদ্র - অভ্যুত্থানের পর দেখা দিয়েছে নূতন ক্ষাত্রযুগ । কোথাও বা নূতন বিপ্রযুগের সূচনাও দেখা যাচ্ছে ।

(৩৬)

প্রকৃত অধ্যাত্মদর্শনই বিশ্বসমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ । সে বিচারে আনন্দমার্গের আদর্শকে বলতে পারি স্পর্শমণি । কবি কল্পনার স্পর্শমণি যেমন সব কিছুকেই সোণায় পরিণত করে দেয় আনন্দমার্গের দর্শনও ঠিক তেমনি যে সমস্যার ওপরেই প্রয়োগ করা হোক না কেন ন্যায় - ধর্মসম্মত সদুত্তর সে অবশ্যই বের করে দেয়

(৩৭)

মানুষের ক্ষুধা অনন্ত । এই অনন্ত ক্ষুধাকে সে যদি জাগতিক ভোগ্য বস্তুর দিকে ছুটিয়ে দেয় তাহলে মানুষে - মানুষে সংঘর্ষ ৰাধৰেই । কারণ জাগতিক সম্পদ সীমিত । একজনের প্রাচুর্য ঘটলে অন্যের অভাব দেখা দেবে । মানুষের এই ক্ষুধা মানস তথা অধ্যাত্ম সম্পদেই মেটাতেই হবে । ব্রহ্ম অকৃপণভাবে অনন্ত মানস তথা অধ্যাত্ম সম্পদ মানুষের সামনে সাজিয়ে রেখেছেন । মানুষকে সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে হবে ।

একতা ও সুৰুদ্ধি মানুষকে সার্থকতার পথে নিয়ে যায় । এই শুভবুদ্ধি জাগাতে গেলে দর্শনের মোটা মোটা ৰই পড়ে কোনো কাজ হবে না , এজন্যে ব্যষ্টিগত জীবনে যম - নিয়মের অনুশীলন করতে হবে । ঐক্য স্থাপনা করতে হলে এমনই একটি আদর্শ বেছে নিতে হবে দৈশিক , কালিক বা পাত্রিক ভেদ যাকে প্রভাবিত করতে পারবে না ; তাই ভূমা - আদর্শকেই — ব্রাহ্মী আদর্শকেই জীবনের ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ করতে হবে । যারা যম - নিয়মে প্রতিষ্ঠিত— যারা ভূমার সাধক , আগেই বলেছি তারাই সদ্‌বিপ্র । মানুষের প্রতিনিধিত্ব কেবল তারাই করবে । নিঃস্বার্থ ভাবে জীবসেবা কেবল তারাই করতে পারে । মানুষ সদ্বিপ্রকে চিনে নেবে তার আচরণ থেকে , তার সেবাপরায়ণতা থেকে , তার কর্মনিষ্ঠা থেকে , তার চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে ।

এই সদ্‌বিপ্ররা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করবে—“ সকল মানুষের একজাত” , “ প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার ” , “ মানুষ – মানুষ ভাই - ভাই ” । এরা বজ্রকণ্ঠে সমাজ - শোষকদের জানিয়ে দেবে— “ মানুষকে শোষণ চলবে না ” , “ ধর্মের ভণ্ডামী চলৰে না ” । শতধাবিচ্ছিন্ন মানুষ - সমাজকে সেবা - ত্যাগের প্রতীক গৈরিক পতাকার নীচে আহ্বান জানিয়ে তারা উদাত্ত কণ্ঠে বলবে— “ দুনিয়ার মানুষ এক হও ” । আর ৰলৰে—

" সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্ । দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে ।। সমানী ব আকুতি সমানাঃ হৃদয়ানি বঃ । সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি " ॥

[রেঁনেসাঁ ক্লাবের স্থাপনাদিবস উপলক্ষ্যে ১৯৫৮ (ইং) সালের ২৬ শে জানুয়ারী ত্রিমোহান (ভাগলপুর) যুবসম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ ।]

[পিছনের মলাটের লেখা]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু–পরমাণুও সকল জীবের এজমালি সম্পত্তি। নীতিগতভাবে এটা মেনে নিতেই হবে, আর এ কথাটা স্বীকার করার পরে এদেশী ও বিদেশী, অমুকের অমুক দেশের নাগরিক হবার যোগ্যতা আছে আর অমুকের নেই, অথবা রাষ্ট্রীয় অধিকার অমুক সম্প্রদায় এতখানি পাবে, তার চাইতে কম পাবে বা পাবে না—এ ধরনের কথাগুলো আর বলা চলে না। বস্তুতঃ এ ধরনের কথায় উৎকটভাবে কায়েমী স্বার্থবাদই ফুটে ওঠে। এক দেশের মানুষ ভূমির অভাবে বা খাদ্যের অভাবে

ক্লেশ পাক, অন্য দেশে থাকুক প্রচুর পতিত জমি বা প্রচুর খাদ্য—এ অবস্থাটাও এক ধরনের পুঁজিবাদ ছাড়া আর কী ? জন্মগতসূত্রে সকলেই বিশ্ব নাগরিক, সকলেরই সর্বত্র যাবার, বাস করবার ও মানুষের মত খেয়ে–পরে বাঁচবার অধিকার আছে। যদি কোন দেশের কোন মানব গোষ্ঠী জীবের এই মৌলিক অধিকারটুকু মেনে নিতে রাজী না হয়ে থাকে, বুঝতে হবে তাদের মুখের শান্তির বুলি নিছক একটা লোক–ভুলানো ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু এই ছোট্ট পৃথিবী নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ–উপগ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, নীহারিকা, সব কিছুতেই মানুষের ঘর রয়েছে। যদি কেউ মানুষকে তার এই জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চায়, মানুষকে শক্তিবলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। “সব দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া । ”

–শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

[সূচীপত্র]

সমাপ্ত

***************X***************

ঘোষণা

আধ্যাত্মিক সাধনা তথা পথনির্দেশনা লাভ করার সুযোগ ও অধিকার নারী–পুরুষ, জাতপাত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান হওয়া উচিত। এই সাধনা বিজ্ঞান পরমার্থের সন্ধান দেয় । যা পরমার্থের সন্ধান দেয় তা কখনোই অর্থকারী ব্যবসায় লাগানো উচিত না । আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী / সন্ন্যাসীনীদের কাছ থেকে যে কোন মানুষ এই সাধনা বিজ্ঞান বিনামূল্যে অনায়াসে শিখতে পারেন।

সাধনা হলো মানস-আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বেয়াম হল শারীরিক অনুশীলন । যদি কেউ ব্যায়াম শিখে তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তবে তার কিছুই লাভ হয় না । ঠিক তেমনি কেউ যদি সাধনা শিখে তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তাহলে তার সাধনা শিখাতে কোন লাভ হয় না ।

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হ'ল পরমানন্দ লাভ করা। একমাত্র সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মোপলব্ধির মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।